দৈনিক

4 JUN 2017

প্রাথমিক শিক্ষার হালচাল

মুহাম্মদ ফরিদ হাসান

প্রাথমিক শিক্ষাকে আমরা বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে চাই। কেননা এটি হচ্ছে কোনো মানুষের জন্য সেই ভিত্তি— যা তার জন্য সারাজীবনের সম্পদ ও পথচলার পাথেয়। একজন মানুষের প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হলে পরবর্তী শিক্ষাব্যবস্থার ধাপগুলোয় সে স্বাভাবিকভাবেই ভালো করতে পারবে। তাই শিক্ষাবিদরা প্রাথমিক শিক্ষাকে মানুষ গড়ার আঁতুড় ঘর হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। পৃথিবীর সব দেশেই প্রাথমিক শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্বসহকারে দেখা হয়। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় অনেক ধরনের পরিবর্তন এসেছে। এসব পরিবর্তনের বেশিরভাগই ইতিবাচক পরিবর্তন। প্রতিবছর বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার হার বাড়ছে, শিক্ষার্থীদের জন্য বাড়ছে সুযোগ-সুবিধা। বাড়ছে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্র। বছরের প্রথম দিন শিক্ষার্থীরা মহাসমারোহে নতুন বই পাচ্ছে, গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা বৃত্তি পাচ্ছে, প্রতিবছর ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার কমছে— এগুলো বাংলাদেশের জন্য অনেক গৌরবের বিষয়। এতসব অগ্রগতি সত্ত্বেও বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা প্রাথমিক শিক্ষায় রয়েছে— যেগুলো এ শিক্ষাব্যবস্থার অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে, বাধাগ্রস্ত করছে অগ্রগতিকে।

প্রথমেই বলতে হয় পাঠ্যবইয়ের কথা। প্রতিবছরই বই প্রকাশ হলে পত্রপত্রিকায় যে খবরটি বেশি দৃষ্টিগোচর হয়— সেটি হলো ভুলে ভরা পাঠ্যবইয়ের খবর। একজন শিক্ষার্থী অথবা একজন মানুষ প্রথমবার ভুল করলে মানা যায়। কিন্তু একজন মানুষ ভুল শুধরানোর চেষ্টা করে। অথচ প্রতিবারই পাঠ্যবইয়ে ভুলের তালিকা দীর্ঘ হয়। অদ্ভুত বিষয় হলো একই ভুল প্রথম শ্রেণিতে পড়া ছাত্রের মতো মন্ত্রণালয় বারবার করে। প্রথম শ্রেণির ছাত্র দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণিতে উঠলে তার ভুল সংশোধিত হলেও পাঠ্যবই সংশ্লিষ্টরা শুদ্ধ ও বিতর্কের বাইরে নিজেদের এখনো উপস্থাপন করতে পারেননি। যাদের ওপর সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা নির্ভর করে, যে পাঠ্যবই কোমলমতি শিশুরা পড়ে— খোদ সেই পাঠ্যবইয়ে প্রতিবছর ভুল থাকে— এটা দেখে আহত হতে হয়। চলতি বছর পাঠ্যবইয়ে ভুলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নানামুখী বিতর্ক। অথচ প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা শিক্ষা মন্ত্রণালয় কি পারে না যথাযথ দায়িত্ব পালন করে শিক্ষার্থীদের হাতে নির্ভুল বই তুলে দিতে? আর যথাযথ দায়িত্ব পালনে যারা ব্যর্থ হচ্ছে বারবার— তাদেরও কি যথাযথ শাস্তি নিশ্চিত করা হয়েছে? আমরা চাই এ বিষয়ে সরকারের ওপরমহল বিশেষ দৃষ্টি রাখুক। কেননা পাঠ্যবইয়ে ভুলের দায় যেমন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা এড়াতে পারেন না, তেমনি সরকারও এড়াতে পারে না। কারণ প্রত্যক্ষ হোক বা পরোক্ষই হোক— সবশেষে এটি সরকারেরই ব্যর্থতা।

পাঠ্যবইয়ের বিষয়ে কথা বলতে গেলে 'বইয়ের বোঝা' কথাটিও সামনে চলে আসে। শিক্ষাবিদ ও গবেষকরা বারবার বলেছেন, শিশুদের ওপর যাতে বই বোঝা হিসেবে না দাঁড়ায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটাই হচ্ছে। সরকার যতই পাঠ্যবই নির্দিষ্ট করে দিক— সরকারি-বেসরকারি অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান সেই নির্দেশনা মানছে না। যার ফলে নির্দিষ্ট পাঠ্যবইয়ের প্রায় দ্বিগুণ, কখনো তারও বেশি বই-গাইড নিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রতিনিয়ত স্কুলে যাচ্ছে। বইয়ের ভারে শিশু শিক্ষার্থীরা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছে। আনন্দময় শিক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে তারা ব্যাগভর্তি বইয়ের বোঝা টানছে। দেশের কিন্ডারগার্টেনগুলোর হাল আরও বেহাল। সেখানে বইয়ের বোঝা আরও বেশি। সরকার কিন্ডারগার্টেনের প্রতি স্বাভাবিক দৃষ্টি রাখে না, সেই সুযোগে তারা যা ইচ্ছে তা-ই করছে। এত চেষ্টা করেও সরকার শিক্ষার্থীদের গাইড বইয়ের হাত থেকে মুক্ত করতে পারছে না। প্রথম শ্রেণি হোক আর পঞ্চম শ্রেণি হোক— গাইড বই শিক্ষাব্যবস্থার নিত্যসঙ্গী হয়ে পড়ছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা, তাদের মেধার যথাযথ বিকাশ ঘটছে না, চিন্তার সুযোগও কমে যাচ্ছে। সর্বোপরি গাইড বইয়ের প্রভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে আমাদের গোটা শিক্ষাব্যবস্থা। গাইড বই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বহু বছর ধরেই আন্দোলন হচ্ছে— কিন্তু নানা কারণে সেই আন্দোলন মাঠে মারা যাচ্ছে। এ আন্দোলন কবে সফল হবে— এ প্রশ্ন এখন অকল্পনীয় মনে হয়। এতটাই পিছিয়ে পড়েছি আমরা!

কোচিং-বাণিজ্য শিক্ষাব্যবস্থার আরও বহুল আলোচিত-সমালোচিত বিষয়। স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী কোচিং-বাণিজ্যের বিরুদ্ধে নেমে খুব একটা সফলতার মুখ দেখতে পারেননি। এ দায়ও তিনি স্বীকার করেছেন। কোচিং-বাণিজ্য বন্ধের প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে বলেছেন। আমরা খুব বিস্মিত হয়ে লক্ষ করি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও সকাল-বিকাল-সন্ধ্যা কোচিং সেন্টার অথবা প্রাইভেট টিচারের কাছে দৌড়াচ্ছে। আরও দুঃখজনক বিষয় হলো, কোচিংয়ের পেছনে দৌড়াতে গিয়ে অনেক শিশু শিক্ষার্থীই খেলাধুলা করার সুযোগ পায় না। ঘুম থেকে উঠে তাদের কাউকে কাউকে প্রাইভেট টিচারের বাসায় মা বা বাবার সঙ্গে ছুটতে হয়, তার

পর স্কুল— তার পর আবার কোচিং এবং রাতে হোমওয়ার্ক করতে করতেই এসব শিশু ঘুমিয়ে পড়ে। পরের দিন সেই একই দিনযাপন। ফলে স্বাভাবিক পরিবেশ ও আনন্দ বিনোদন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। নিরানন্দে ছেয়ে গেছে তাদের মুহূর্তগুলো। এ কারণে শিক্ষার্জন তাদের কাছে জোর করে গলাধঃকরণ ছাড়া ভিন্ন কিছু মনে না হওয়াই স্বাভাবিক। এমন দিনযাপনের মধ্যে যেসব শিক্ষার্থী বেড়ে ওঠে, তাদের মানসিক বিকাশ কতটুকু হয় তা প্রশ্ন থাকাই স্বাভাবিক। শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি এ জন্য আমাদের অভিভাবকদের মধ্যে অতিরিক্ত প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব কম দায়ী নয়। প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে আমরা ভুলে যাই, আমার শিশুটির ওপর মানসিক চাপ পড়ছে কিনা, বই বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে কিনা। পৃথিবীর অনেক দেশ রয়েছে সেখানে শিশুদের কথা চিন্তা করে প্রাথমিক শিক্ষায় পরীক্ষা কম রাখা হয়েছে। আনন্দের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা পড়ছে কিনা তার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অথচ আমাদেরও এমন গুরুত্ব দেওয়ার কথা কাগজে-কলমে আছে। এ যেন কাজির গরু কেতাবে আছে কিন্তু গোয়ালে নেই!

শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ শিক্ষক। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিক্ষকদের বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাদের জন্য রয়েছে বাড়তি সুযোগ-সুবিধাও। দুঃখের বিষয়, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষক সংকট বহু পুরনো জাতীয় সমস্যা। এমনকি এ দেশে কয়েক হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে যেখানে প্রধান শিক্ষক নেই। গত ১৯ মার্চ প্রকাশিত একটি জাতীয় দৈনিক সূত্রে জানা যাচ্ছে, দেশের ১৭ হাজারের বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে। ১৭ হাজার ৫শ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই— এ অবস্থার উত্তরণও হচ্ছে না। দেশে প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষকের অনুমোদিত পদ রয়েছে ৬৫ হাজার ৪৬টি। অর্থাৎ দেশের ২৯ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। আরও স্পষ্ট করে বললে প্রতি চারটি বিদ্যালয়ের একটি চলছে প্রধান শিক্ষকবিহীন। আর অভিভাবকহীন সংসারের অবস্থা কেমন হয় তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এ তো গেল প্রধান শিক্ষকের কথা। যেখানে প্রধান শিক্ষকের মতো গুরুত্বপূর্ণ এতগুলো পদ খালি, সেখানে সহকারী শিক্ষকের কী হালচাল তা অনুধাবনযোগ্য। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাব মতে, প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে সহকারী শিক্ষকের পদসংখ্যা ২ লাখ ২৭ হাজার ২৯৬টি। আর এর মধ্যে খালি রয়েছে ২৫ হাজার ২৯৫টি। অর্থাৎ প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক মিলিয়ে সারা দেশে শিক্ষক নেই ৪২ হাজার ৭৯৫ জন। আরেকটি পরিসংখ্যান এখানে উপস্থাপন করা যাক। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে দেশে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৮২ হাজার ৮৬৪টি। শিক্ষক রয়েছেন ৩ লাখ ২২ হাজার ৭৬৬ জন। এসব বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ২ কোটি ১৯ লাখ ৩২ হাজার জন। অর্থাৎ প্রতি ৬৮ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন করে শিক্ষক রয়েছেন। যদি শিক্ষক সংকট দূর হতো তবে এ হার আরও কমে আসত। শিক্ষার্থীরাও শিক্ষকের কাছে আরও সাবলীলভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারত। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বারবারই বলেছে, তারা এ সংকট দূর করতে কাজ করছে। আমরা তাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবে দেখতে চাই। কারণ শিক্ষক সংকট দূর না হলে প্রকৃত অর্থে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি হবে না।

সহ-শিক্ষা কার্যক্রমের কথা একটু বলতে হয়। সরকারের এ বিষয়ে জোরালো উদ্যোগ রয়েছে। প্রতিবছর বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নবোদ্যম আমরা লক্ষ করেছি। সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই— যদি কোচিং-বাণিজ্য, বইয়ের বোঝা না কমানো যায়, তবে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রম থেকে দূরে চলে যাবে। প্রশ্নফাঁসের ব্যাপারেও মন্ত্রণালয়ের সজাগ দৃষ্টি থাকা বাঞ্ছনীয়। পাশাপাশি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়নের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। শ্রেণিকক্ষ যেন নিরাপদ, সুন্দর হয়। আমাদের কোনো শিক্ষার্থী ক্লাসে গিয়ে ভবনধসের আতঙ্কে ভুগবে, খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করবে— আমরা এমনটি প্রত্যাশা করি না। অভিভাবক সমাবেশ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা উপকরণ থেকে দৃষ্টি সরালে চলবে না। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে হালকা করে দেখার ফল হবে লাখ লাখ শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। আমরা প্রত্যাশা করি, সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় শিক্ষক সংকট, কোচিং-বাণিজ্য রোধ, বইয়ের বোঝা দূর করতে অতিদ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং কাঙ্ক্ষিত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠন ত্বরান্বিত করবে।

❑ মুহাম্মদ ফরিদ হাসান : প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক